রাতের শেষে রোদ্দুর

অনেকেই বলেন বাঙ্গালী নারী সুন্দরী শাড়িতে। মাড় দেয়া কোচকানো চড়া পাড়ের তাতের শাড়ি, খোপায় তার বেল ফুলের মালা জড়ানো, হাত ভর্তি রঙ্গীন কাচের চুড়ি আর কপালে উজ্জল টিপ। সুন্দর, সজ্জিত কাউকে দেখতে কারই বা না ভালো লাগে? প্রবাদ আছে সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র। আজকে শাড়ি নিয়ে, বাঙ্গালী মেয়েদের পোষাক, সাজ, ফ্যাশন নিয়ে চলছে দারুন গবেষনা, কিভাবে আরো আধুনিক আর আকর্ষনীয় করে তোলা যায়? কি করে সুন্দরীদের আরো সাজিয়ে তোলা যায়? বাঙ্গালী মডেলরা আজকে তাদের সাজ - পোশাক, কালো চুল আর শ্যাম বর্ণের জন্য বিশ্ব জুড়ে আদৃত, সে বিবি রাসেলই হোক কিংবা বিপাশা বসু। কিন্তু চিরকালই এরকম ছিল? চিরকালই কি মেয়েরা নিজের ইচ্ছেমতো নিজের পছন্দের সাজে নিজেকে সাজাতে পেরেছিল? একটা সময় ছিল যখন কি হিন্দু কি মুসলমান বাঙ্গালী মেয়েরা ঘরের বাইরে পা রাখতেন না। দু / চার বছরে একবার বাপের বাড়ি নাইওর যাওয়াই ছিল একমাত্র অন্তপুর থেকে বের হওয়া, তার বাইরে হিন্দু মেয়েদের বড় জোর পাল্কীতে আগা পাশ তলা মুড়ে একমাত্র গন্তব্য ছিল গঙ্গা স্নান, মুসলমান মেয়েদের তাও ছিল না। বাইরে যেহেতু যাওয়ার ব্যাপার ছিল না তাই মেয়েদের পোষাক নিয়ে ভাবারও তেমন কিছু ছিল না। উদোম গায়ে শাড়ি জড়ানোই ছিল বেশীর ভাগ বাঙ্গালী মহিলার পোষাক। সেমিজ বা ব্লাউজের প্রশ্নতো ছিলই না বরং সেটা ছিল নিন্দনীয়। শীতকালে তারা এই শাড়ির উপর একটি চাদর জড়াতেন। উচ্চ বংশীয় মুসলমান মেয়েরা অবশ্য অনেকটা দিল্লীর মুঘল রাজপরিবারের মহিলাদের অনুকরনে চোস্ত , কামিজের মতো দেখতে এ ধরনের পোষাক প্র্যাত্যহিক জীবনে ও উৎসবাদিতে ব্যবহার করতেন। পেশোয়াজেরও প্রচলন ছিল। সাধারণতঃ দেখা গেছে উচ্চবিত্ত বাঙ্গালী পুরুষদের চলায় বলায়, রুচিতে - আয়েশে সব জায়গায় তখন অনেকদিন ধরেই একটা মুসলমানি ছাপ বিদ্যমান ছিল শুধু নারীদের বেলায়ই উপযুক্ত পোষাকের কথা কিংবা নারীদের আরামদায়ক বা শোভন কোন পোষাকের কথা কেউ ভাবেন নি। বাঙ্গালী নারী জাগরনের অনেক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ঠাকুরবাড়ির অনেক অবদান আছে। শুধু ঠাকুর বাড়ির পুরুষরাই নয়, তাদের সঙ্গিনীরাও তাদের পাশে থেকে পায়ে পা মিলিয়ে সমাজে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেছেন। আধুনিক বাঙ্গালী মেয়েদের শাড়ি পড়ার এই কায়দা অনেকটা তাদেরই প্রচেষ্টা থেকে আসা। এইসব পরিবর্তনে অগ্রগামী ভূমিকা রাখার জন্য তাদেরকে অনেক কষ্ট, যন্ত্রণা, অপমান সহ্য করতে হয়েছে, ঘরে - বাইরে।

জোড়াসাকোর ঠাকুর বাড়ির মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ছেলে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিলেত থেকে পড়াশোনা করে আসার পর তার প্রথম কর্মস্থল হলো মহারাষ্ট্র। সে যুগে বাড়ির বউদের স্বামীর সাথে তাদের কর্মস্থলে থাকার কোন প্রশ্নই ছিল না। কিন্তু সত্যেন্দ্র নাথ তার সময়ের তুলনায় অনেক এগিয়ে ছিলেন। তিনি তার স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনীকে অসংখ্য ব্যাপারে সংস্কারের বেড়ি খুলে বেরিয়ে আসার জন্য উৎসাহ দিতেন। কিন্তু জ্ঞানদানন্দিনীকে অসংখ্য দিক মানিয়ে চলতে হতো বলে কিছুটা স্বামীর মন রক্ষার্থে এক পা এগোলে আবার শাশুড়ি ও অন্যান্যদের মন জোগাতে তিন পা পেছোতেন। সত্যেন্দ্র তার বাবার কাছে আর্জি পেশ করলেন তিনি তার স্ত্রীকে তার সাথে তার কর্মস্থলে নিয়ে যেতে চান। চারিদিক থেকে ছি ছি রব উঠল, বাড়ির বউ ট্রেনে বাসে চড়ে ব্যাটা ছেলদের মতো বিদেশ যাবে ? অন্তঃপুরের শুচিতা নষ্ট করবে বর্হিজগতের ছোয়া এনে। ধিক্কারে ধিক্কারের চূড়ান্ত। কিন্তু মর্হষি দেবেন্দ্রনাথ অনেক ক্ষেত্রেই উদার ছিলেন। অন্তঃপুরের শত নিষেধ বাধা উপেক্ষা করেও মর্হষি জ্ঞানদানন্দিনীকে তার কর্মস্থলে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। প্রথমেই সমস্যা এলো সামনে, কি পরে যাবেন জ্ঞানদানন্দিনী এতোটা পথ? কিছুতেই মানানসই কিছু ভাবতে না পেরে তখনকার মতো ফরাসী দোকানে ওর্ডার দিয়ে বানানো হলো কিম্ভুতকিমাকার ‘ওরিয়েন্টাল ড্রেস’। সে পোষাক জ্ঞানদানন্দিনী নিজে নিজে পরতে পারলেন না, সত্যেন্দ্র তাকে সাহায্য করলেন পরতে। খোলা - পরা দুইই জ্ঞানদানন্দিনীর একার পক্ষে অসাধ্য ছিল। এই পরিচ্ছদ

সমস্যা জ্ঞানদানন্দিনীকে এতোটাই বিব্রত করেছিল এবং ভাবিয়েছিল যে তিনি মেয়েদের রুচিশোভন এবং আরামযায়ক, সহজে পরিধেয় পোষাক নিয়ে ভাবতে শুরু করেন। আজকের বাঙ্গালী মেয়েদের সাজ পোষাকের এই ধরনটি কিছুটা তার সেদিনের চিন্তারই ফসল। মুম্বাইয়ে পুরো দু বছর থাকলেন জ্ঞানদানন্দিনী, এরপর যখন তিনি কোলকাতায় এলেন, সর্ম্পুন ভিন্ন এক রমনী, আর সেদিন থেকেই প্রকৃতপক্ষে শুরু হলো বাঙ্গালী মেয়েদের জয়যাত্রা।

মুম্বাইয়ে গিয়ে সর্বপ্রথম জ্ঞানদানন্দিনী তার জবরজং ওরিয়েন্টাল ড্রেসটি বর্জন করে পার্শী মেয়েদের শাড়ি পড়ার মিষ্টি ছিমছাম রীতিতি তুলে নিলেন, একটু নিজের রুচি মতো অদল - বদল করে। তার শাড়ি পড়ার এই রুচি সম্মত কায়দাটি অনেকেরই নজর কারলো, ঠাকুর বাড়ির অনেক মেয়েই শাড়ি পড়ার এই পদ্ধতিটিকে গ্রহন করলেন। তাদের দেখে ব্রাক্ষিকারাও এই কায়দার শাড়ি পড়াতে আকৃষ্ট হলেন। মুম্বাই তৎকালীন বোম্বাই থেকে আনা বলে ঠাকুরবাড়িতে এই শাড়ি পরার ঢংয়ের নাম ছিল ‘বোম্বাই দস্তুর’ কিন্তু বাংলাদেশের মেয়েরা একে বলতো ‘ঠাকুরবাড়ির শাড়ি’। জ্ঞানদানন্দিনী মুম্বাই থেকে ফিরে মেয়েদেরকে এই শাড়ি পড়া শেখানোর জন্য কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। অনেক সম্ভ্রান্ত বাড়ির মেয়েরা এসেছিলেন এই ঢংয়ের শাড়ি পড়াটি শিখতে, তাদের মধ্যে ব্রাক্ষিকাদের সংখ্যাই ছিল উল্লেখযোগ্য। সর্বপ্রথম এসেছিলেন বিহারী গুপ্তের স্ত্রী সৌদামিনী, অবশ্য তখনও তিনি অবিবাহিতা ছিলেন। প্রসংগত উল্লেখ্য শাড়ির সাথে জ্ঞানদানন্দিনী শায়া-সেমিজ-ব্লাউজ-জ্যাকেট পরাও প্রচলন করেন। সেই সময়ে আস্তে আস্তে নারীদের জাগরন আরম্ভ হয়েছিলো, আশপাশ থেকে একটা একটা করে আলোর জানালা গুলো খুলছিলো। মেয়েরা নানারকম সমালোচনা, ব্যঙ্গ সহ্য করেও আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসছিলেন। তাই বাইরে বেরোবার একটি রুচিশীল বেশ মেয়েদের তখন আবশ্যিকের পর্যায়ে চলে গিয়েছিলো। সর্বপ্রথম বাইরে বেরোনোর সূচনা করেন ধরতে গেলে ঠাকুর বাড়ির মেয়েরাই। বাঙ্গালী মেয়েদের মধ্যে প্রকাশ্যে সভায় যোগদান বলতে জ্ঞানদানন্দিনী লাটভবনে গিয়েছিলেন নিমন্ত্রন রক্ষা করতে, তারপর অবশ্য তিনি বিলেতও যান। তিনি ছাড়াও সে সময় রাজকুমারী বন্দোপাধ্যায় বিলেত ভ্রমন করেন। সনাতনপন্থীরা এ নিয়ে ভীষন হৈ চৈ করেন। যা হোক এধরনের রোগ ভয়াবহ ছোয়াচে হয়, তাই একটি একটি করে নতুন নতুন মুখ বন্ধ ঝরোকা খুলে উকি দিতে শুরু করলই। ঠাকুর বাড়ির মেয়েদের সাথে যোগ দিলেন ব্রাক্ষ মেয়েরা। ব্রাক্ষ মেয়েরা তখন মন্দিরে চিকের আড়ালে বসে প্রার্থনা করতেন। ১৮৭২ সালে কয়েকজন আর্চাযকে জানালেন তারা আর স্বতন্ত্র বসবেন না, যে কথা সে কাজ। অন্নদাচরন খাস্তগীর ও দুর্গামোহন দাস তাদের স্ত্রী ও মেয়েদের নিয়ে এসে বাইরে বসলেন সাধারণ উপাসকদের সঙ্গে। কেশব সেন বাধ্য হয়েই তখন পর্দা ছাড়াই মেয়েদেরকে উপাসনা মন্দিরে বসবার অনুমতি দিলেন। সেই ছিল প্রকাশ্যে পর্দা প্রথার বিরোধিতা। বাইরে বেরোনোর জন্য অনেক বাঙ্গালী মেয়েই তখন গাউন পড়তেন, ঠাকুরবাড়ির মেয়ে ইন্দুমতী, মনোমোহন ঘোষের স্ত্রী। কিন্তু সব বাঙ্গালী মেয়েরা গাউন পরতে রাজি ছিলেন না বলে দুর্গামোহন দাসের স্ত্রী ব্রক্ষময়ী পড়তেন এক রকমের জগা খিচুরী মার্কা পোষাক। গাউনের উপড়ের দিকে আচল দিয়ে আধা বিলেতি আধা দেশী ধরনের পোষাক। কিন্তু ‘বোম্বাই দস্তুর’ নতুনত্ব, রুচিশীলতা ও পরিধানের সুবিধার জন্য সবার দৃষ্টি আকর্ষন করেছিলো। তবে এতে মাথায় আচল দেয়া যেতো না বলে প্রগতিশীলরা মাথায় একটি ছোট টুপি পড়তেন। সামনের দিকটা মুকুটের মতো, পেছনের দিকে একটু চাদরের মতো কাপড় ঝুলতো। তবে পরে আবার যখন সাবেকি ধরনের শাড়ি পড়ার কায়দা ফিরে এসেছিলো, তখন জ্ঞানদানন্দিনীর মেয়ে ইন্দিরা শাড়ির আচল দিয়ে মাথায় ছোট্ট ঘোমটা টানার প্রচলন করেন।

স্বর্ণকুমারী দেবী

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী

আজকাল মেয়েরা যে আধুনিক ঢংটিতে শাড়ি পড়ে সেটি কিন্তু জ্ঞানদানন্দিনীর দান নয়। 'বোম্বাই দস্তুর' এ মেয়েদের যে যে অসুবিধাগুলো হতো সেগুলোকে দূর করেন কুচবিহারের মহারানী কেশব কন্যা সুনীতি দেবী। তিনি শাড়ির ঝোলানো অংশটিকে কুচিয়ে ব্রোচ আটকাবার ব্যবস্থা করেন। আর সঙ্গে তিনি মাথায় পড়তেন স্প্যানিশ ম্যানটিলা জাতীয় একটি ছোট্ট ত্রিকোন চাদর। তার বোন ময়ুরভঞ্জের মহারানী সুচারু দেবী দিল্লীর দরবারে প্রায় আধুনিক ঢংয়ের শাড়ি পড়ার কায়দাটি নিয়ে আসেন। এটিই নাকি তার শ্বশুর বাড়িতে শাড়ি পড়ার প্রাচীন কায়দা। উত্তর ভারতের মেয়েরা সামনে আচল এনে যেভাবে মিষ্টি কায়দায় শাড়ি পড়ে তাতে এই ধরনটিকেই সবচেয়ে প্রাচীন বলে মনে করা হয়। বাঙ্গালী মেয়েরাও স্বাচ্ছন্দ্যতার জন্য এটিকেই গ্রহন করে, তবে জ্ঞানদানন্দিনীর মতো আচলটি বদলে তারা বা দিকেই রাখল। কিছুদিন বিলেতি কায়দায় হবল স্কার্টের অনুকরনে 'হবল' করে শাড়ি পড়াও শুরু হলো। তবে সেটা খুব একটা জনপ্রিয় হয়নি সবার মাঝে। সে সময় নানা রকমের লেস দেয়া জ্যাকেট আর ব্লাউজের প্রচলন শুরু হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, 'বিলিতি দরজির দোকান থেকে যত সব ছাটাকাটা নানা রঙ্গের রেশমের ফালি'র সঙ্গে নেটের টুকরা আর খেলো লেস মিলিয়ে মেয়েদের জামা বানানো হতো। '

সীতা ও শান্তা চট্টোপাধ্যায়

ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী

এই নতুন বেশের রমনীরা সনাতন হিন্দুসমাজের চোখে ছিলেন খুবই হাস্যস্পদ। সেলাই করা জামা পড়ে রাস্তায় বেরোলে তাদের নিয়ে ধিক্কারের হাসির ঝড় উঠতো। তারা ছিলেন অনেকটা যোগেন বসুর 'মডেল ভগিনী'র মতো অন্যধরনের জীব। উপরন্তু হিন্দুদের সেলাই করা জামা পরে কোনও শুভ কাজ করতে নেই, তাই পোষাকের এই পরিবর্তন নিয়ে বেশ প্রতিবাদী হয়ে উঠেন সমাজের অনেকেই। কিন্তু যুগের পরিবর্তেনের কারণে তারা মুসলমানী পোষাককে আটকাতে পারলেও ব্রাহ্মিকাদের পোষাককে বাধা দিতে পারলেন না। নতুন ধরনের এই শাড়ি পড়ার নামই হয়ে গেলো ব্রাহ্মিকা শাড়ি। তবে বিয়ের সময় কিংবা পূজো - আর্চ্চার সময় সনাতন ভঙ্গীর শাড়ি পড়াটাই চলত। ১৯০১ সালে গগনেন্দ্র যখন তার ন বছরের মেয়ে সুনন্দিনীকে সম্প্রদান করতে যাচ্ছেন তখন বর পক্ষ আপত্তি জানালেন সেলাই করা কাপড়ে মেয়েকে সম্প্রদান করা যাবে না। গগনেন্দ্র ঠাকুর বাড়ির ছেলে হলেও সনাতন পন্থাই মেনে চলতেন তার বাড়িতে। তিনি উদারভঙ্গীতে হেসে বললেন, 'কই দেখুন মেয়ের গায়ে কোন জামাতো নেই।' সবাই দেখলেন সত্যিইতো মেয়ের গায়ে কোন জামা নেই, শিল্পী

গগনেন্দ্র তার নিজস্ব পরিকল্পনা দিয়ে মেয়েকে এমন ভঙ্গীতে সাজিয়েছেন, কাপড় পরিয়েছেন যে দেখে কেউ বুঝতেই পারেনি যে ভিতরে জামা নেই। তবে তার এই কনে সাজাবার ঢংটি সবারই বেশ পছন্দ হয়েছিল।

মেয়েদের পোষাক পরিচ্ছদের এই যুগান্তকারী পরিবর্তনে শুধু জ্ঞানদানন্দিনীই নয়, ঠাকুরবাড়ির মধ্যে থেকে তার দুই ননদ সৌদামিনী আর স্বর্নকুমারীরও অনেক অবদান আছে। ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা ছাড়াও সে সময়ের ব্রাহ্ম সমাজের অন্যান্য মেয়েদেরও এই প্রগতিশীলতার যুদ্ধে অপরিসীম অবদান আছে। আজকে বাঙ্গালী মেয়েরা যে স্বাচ্ছন্দ্য ভঙ্গীতে শাড়ি পড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার পিছনে এক সময় অনেক অনেক পরিকল্পনা, পরিশ্রম, শিল্প ভাবনা কাজ করেছে। এ ভাবনাগুলো বাস্তবে প্রয়োগ করতে যেয়ে রীতিমতো অনেকে নিন্দিত হয়েছেন, ছোটোখাটো আন্দোলনের মাঝে দিয়েই ধরতে গেলে এই শাড়ি পড়ার কিংবা মেয়েদের সামাজিকভাবে গ্রহনযোগ্য বাইরে বেরোবার দৃষ্টি নন্দন পোষাক বাংলায় চালু হয়েছে। মেয়েদের আত্মনির্ভরশীলতার প্রথম সূচনা কিন্তু হয়েছিল পোষাকের বিপ্লবের মধ্যে দিয়েই।

তানবীরা তালুকদার হোসেন
২৩।১১।২০০৭

তথ্য সূত্র :

জোড়াসাকো থেকে পৃথিবীর পথে - বাসব ঠাকুর
ঠাকুরবাড়ির কথা - হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়
ঠাকুরবাড়ির অন্দর মহল - চিত্রা দেব